মরছে চিংড়ি বাড়ছে হতাশা

● **এমএম ফিরোজ**

বাগদা চিংড়ি উৎপাদনের অন্যতম প্রধান এলাকা লবণপানি অধ্যুষিত মংলাসহ আশপাশের এলাকা। কিন্তু বর্তমানে প্রচণ্ড গরম এবং তীব্র পানিসঙ্কটে এ এলাকার অধিকাংশ চিংড়িঘেরে ব্যাপকহারে চিংড়িপোনা মরে যাচ্ছে। এতে এ অঞ্চলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম বাগদা চিংড়ি উৎপাদিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। চিংড়িচাষিদের মধ্যে দেখা দিয়েছে চরম হতাশা।

মংলা উপজেলার চাঁদপাই গ্রামের চিংড়ি চাষী মো. আবদুল্লাহ জানান, 'এ এলাকার অধিকাংশ ঘেরে প্রয়োজনীয় পানি নেই। প্রচণ্ড গরমে পানির পিপিটি কমে যাচ্ছে। ফলে পানিস্বল্পতায় ঘেরের মাছ মরে যাচ্ছে।' সুন্দরবন ইউনিয়নের বাঁশতলা গ্রামের চিংড়িঘের ব্যবসায়ী মো. ইব্রাহীম জানান, তার ঘেরে অতিরিক্ত তাপমাত্রার ফলে চিংড়ি মরে যাচ্ছে, একই সঙ্গে মাছের শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া রেণুতে নানা ধরনের ভাইরাস আক্রমণেও চিংড়ির সংখ্যা কমছে। এতে তারা এবার ঘেরের হারি ও ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করতে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। মংলা উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ দেব বলেন, চিংড়ি মাছের খামারে সাধারণত সাড়ে তিন থেকে চার ফুট পানি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু প্রচণ্ড গরমে অনেক ঘেরে ১ ফুট-এরও কম পানি আছে। মাটি ও পানির অত্যধিক তাপের কারণে অক্সিজেন সঙ্কটে পানি দূষিত হয়ে চিংড়ি মরছে। তাছাড়া হিটস্ট্রোকেও চিংড়ি মরে যাচ্ছে বলে জানান তিনি।

শান্তির হাটে শান্তি নেই

● **এসএম আজাদ**

বেচাকেনায় শান্তির জন্য হাটের নাম শান্তির হাট হয়েছিল কি না জানা যায়নি, তবে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী শান্তির হাটে এখন শান্তি যে উধাও হয়ে গেছে তা অনায়াসে বলা যায়। বাজারের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ফেনী নদীকে কেন্দ্র করে এই হাটটি এক সময় উত্তর চট্টগ্রাম, ফেনী ও নোয়াখালী জেলার মানুষের জন্য 'মিনি বন্দর'-এ পরিণত হলেও এই হাট ও নদী– কোনোটিরই এখন সেই জৌলুস নেই। নদী শুকিয়ে এখন তা মরা খাল।

স্থানীয়দের অনুরোধে ১৯৩০ সালের দিকে স্থানীয় সমাজসেবী জমিদার হাজি নুরুল আবছার চৌধুরী (কেনু মিয়া) তিন বিঘা জমি দান করেন শান্তির হাট প্রতিষ্ঠার জন্য। ধীরে ধীরে সেই তিন বিঘা জমি বিস্তৃত হয় ২২ বিঘায়। হাট ঘিরে গড়ে ওঠে শত শত দোকানপাট। এই হাটের দুই শতাধিক দোকান বন্ধ হয়ে পড়ে আছে এক যুগ ধরে। অনেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে অন্যত্র নিয়ে গেছেন। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান তারেক ইসমত জামসেদী বলেন, এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র ছিল শান্তির হাট। ১৯৮৬ সালে মুহুরি প্রকল্প চালু হওয়ার পর এর অবনতি শুরু হয়। বারইয়ারহাট হাইওয়েও বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। হাটটি এখন আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে।

যশোরের পাখির বাসা

● **মামুন রহমান**

অজ্ঞতা আর মধ্যস্বত্বভোগীদের অসহযোগিতার কারণে যশোর থেকে পাখির বাসা রফতানি ব্যাহত হচ্ছে। পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্যও পাচ্ছেন না এ শিল্পের শ্রমিকরা। পাখির বাসা তৈরি করা হস্তশিল্পীরা এ কাজে আগ্রহও হারিয়ে ফেলছেন। এতে দেশের অখ্যাত এ হস্তশিল্পের জন্য বিদেশে বাজার সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা হোঁচট খাচ্ছে। যশোর সদর উপজেলার সীতারামপুরের চণ্ডীদাস, বিজয় দাস, শ্রীদাম দাসসহ আরো অনেকে জানান, ১৯৮১ সাল থেকে তাদের এলাকায় পাখির বাসা তৈরির কাজ শুরু হয়। তাদের দেখাদেখি সীতারামপুর, কচুয়া, বাহাদুরপুর, দলিরগাতি ও চাউলিয়া গ্রামের ঋষি সম্প্রদায়ের লোকেরা পাখির বাসা তৈরি শুরু করেন। সাধারণত বাঁশ, নারকেলের ছোবড়া এবং খেজুর বা নারকেল গাছের পাতা এবং বিছালি (ধান গাছ) ব্যবহার করে এসব বাসা তৈরি করা হয়। এ গ্রামের চণ্ডীদাস জানান, ৪ জনের একটি পরিবার সপ্তাহে ছোট আকারের দুশ থেকে আড়াইশ বাসা তৈরি করতে পারে। তাতে তাদের পরিবারপ্রতি দৈনিক ২শ থেকে ৩শ টাকা আয় হয়। রাজারহাটের বিক্রেতা শুকলাল দাস জানান, ডেল্টা পেটস নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসব বাসা রফতানি করে। রাজারহাট থেকে মাসে একটি চালান পাঠানো হয়। এখান থেকে যে পরিমাণ বাসা পাঠানো হয়, তা দিয়ে বছরে প্রায় ২ কোটি টাকা আয় হচ্ছে। তবে সদর উপজেলার বাহাদুরপুর ঋষিপাড়ার শিল্পীরা জানান; স্থানীয় ক্রেতাদের অসহযোগিতার কারণে পাখির বাসা তৈরিতে তারা আগ্রহ হারাচ্ছেন।

চান্দিনায় স্বাস্থ্যসেবা

ডাক্তার আসেন সপ্তাহে দু-এক দিন

● ইয়াসমীন রীমা

কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলো কার্যত অচল। ডাক্তার, ইনচার্জসহ সংশ্লিষ্টরা যে যার মতো আসা-যাওয়া করেন। এতে ভোগান্তিতে পড়েন ক্লিনিক এবং এলাকার সাধারণ রোগীরা।

অভিযোগ রয়েছে, ক্লিনিকগুলোতে ডাক্তাররা সপ্তাহে আসেন মাত্র দু-এক দিন। মাসের শেষে এসে কয়েকদিন থেকে হাজিরা খাতাপত্র ঠিকঠাক করে সরকারি বেতন-ভাতাসহ সুযোগ-সুবিধা নেন। কিন্তু জনগণকে তেমন একটা সেবা দেন না। ভুক্তভোগীরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলেও রহস্যময় কারণে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় না। এলাকাবাসী অভিযোগ করেন, সাধারণ রোগীদের ঠিকমতো ওষুধ-পথ্যও দেয়া হয় না। সরকারি বরাদ্দকৃত ওষুধ কোথায় যায়, তা নিয়ে এলাকায় প্রশ্ন উঠেছে। সরকারি চার্ট দেয়া থাকলেও ওষুধের জন্য সেই চার্টের অতিরিক্ত টাকা নেন কর্মকর্তারা।

এ ব্যাপারে চান্দিনা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ ইউসুফ ডাক্তার এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, 'তারা অফিস করে, তবে কখনো কখনো হয়তো কিছুটা দেরি হয়।' তবে অনিয়মের কথা তিনি স্বীকার করেন। তিনি আরো বলেন, 'ছুটি না নিয়ে যারা অনুপস্থিত ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।' কুমিল্লা সিভিল সার্জন ডা. মুজিব রাহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

স্বপ্ন দেখানো আম বাগান

● সৌমিত্র শীল চন্দন

বেকার ছিলেন, কিন্তু হতাশা নিয়ে ঘরে বসে থাকেননি। আয়ের পথ করে নিয়েছেন আমের বাগান করে। বিভিন্ন ধরনের আম রয়েছে তার বাগানে। এখন রীতিমতো স্বাবলম্বী রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার বহরপুর ইউনিয়নের ইলিশকোল গ্রামের সাইদ খান। তার সঙ্গে কাজ করে অনেকেই কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। তার স্বপ্ন, রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জের মতো রাজবাড়ীকেও আমে সমৃদ্ধ করবেন।

এক সময় সাইদ খান ছিলেন অ্যাক্রোবেট খেলোয়াড়। বেশ সুনামও কুড়িয়েছিলেন। কিন্তু যা রোজগার হতো তাতে সংসার চালানো তো দূরের কথা, নিজেরই চলত না। নিজেই বুদ্ধি করে ২০০৭ সালের দিকে নিজ জমিতে কিছু আমের চারা রোপণ করেন। গাছগুলো বড় হতে থাকলে তার ইচ্ছেগুলোও প্রবল হয়ে ওঠে। বাগানটিতে আম্রপালি, ফজলি, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, আশ্বিনিসহ বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করেন। নিজেই গাছগুলোর পরিচর্যা করতেন। দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন বাগানের পেছনে। বর্তমানে তার বাগানে গাছের সংখ্যা প্রায় তিনশ। গত বছরই গাছগুলোতে প্রথম ফল ধরে। এখান থেকে আয় হয়েছিল প্রায় আড়াই লাখ টাকা। তার এই আম বাগানে এখন কাজ করছে ১০ শ্রমিক। এছাড়া তিনি নিমপাতা দিয়ে এক ধরনের স্প্রে তৈরি করেছেন– যেটি গাছের পোকামাকড় মেরে ফেলতে সহায়তা করে, কিন্তু ফল বা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর নয়। তার আশা, এ বছর জেলার চাহিদা মিটিয়ে পার্শ্ববর্তী অনেক জেলাতেও আম রফতানি করতে পারবেন। সাইদ খানের দেখাদেখি ইলিশকোল গ্রামের অনেক বেকার যুবক উৎসাহী হয়ে উঠছেন আম বাগান গড়ে তুলতে।

ইলিয়াসের খড়ম

● লিটন ঘোষ জয়

খড়মের ব্যবহার মানুষ প্রায় ভুলেই গেছে। খালি ব্যবহার কেন, নতুন প্রজন্মের অনেকে হয়তো এর সঙ্গে পরিচিতও নন। তবে মাগুরা শহরের বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ করেই এই প্রাচীন পাদুকা বিক্রি হচ্ছে দেখে অনেক পথচারীই বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে যান। দেখেন খড়মের রকমফের। কেনেনও অনেকেই। পঞ্চাশোর্ধ্ব ইলিয়াস মণ্ডল উত্তরবঙ্গ থেকে খড়ম বিক্রি করতে এসেছেন মাগুরায়। তিনি দেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে খড়ম বিক্রি করছেন। বেচাকেনা ভালো হওয়ায় এটিকে তিনি নিয়েছেন পেশা হিসেবে। দুই বছর ধরে তিনি এ পেশায় জড়িত। এর আগে তিনি ফেরি করে সিরামিকপণ্য বিক্রি করতেন। বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের সুবাদে ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের আর্টিলারি বড় ব্রিজের পাশে একটি খড়ম তৈরির কারখানা চোখে পড়ে তার। সেখান থেকেই তিনি এ দ্রব্যটির প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তী সময়ে ওই কারখানা থেকে পাইকারি দরে খড়ম কিনে তা দেশের বিভিন্ন জেলায় ফেরি করে বিক্রি করতে শুরু করেন।

মাগুরা শহরের চৌরঙ্গী এলাকায় খড়ম বিক্রির সময় কথা প্রসঙ্গে ইলিয়াস মণ্ডল জানান, 'বর্তমানে মানুষ খড়মের ব্যবহার একেবারেই ভুলতে বসেছে। অথচ এক সময় আমাদের মুরব্বিরা পায়ে খড়ম পরতেন। কিন্তু চামড়া ও প্লাস্টিকের জুতা-স্যান্ডেলের ভিড়ে এক সময়ের ঐতিহ্য এই খড়মের ব্যবহার হারিয়ে যেতে বসেছে। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এটির নাম পর্যন্ত জানে না।'